মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবদান

[বাংলা– Bengali – بنغالي]

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013-1434

IslamHouse.com

الرسول ﷺ في تحقيق حقوق الإنسان

« باللغة البنغالية »

الدكتور محمد منظور إلهـي

مراجعة:د/ أبو بكـر محمد زكريا

2013 - 1434

IslamHouse.com

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবদান

ভূমিকা:

মানবাধিকার বলতে বুঝায় মহান আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক প্রদত্ত মানুষের সহজাত অধিকার। সাম্প্রতিক সময়ে এ বিষয়টি বিশ্বব্যাপী আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যদিও মানবাধিকারের মানদন্ড, সমাজভেদে এর সংজ্ঞা, প্রয়োগ ও সীমারেখা নিয়ে তৈরী হচ্ছে নানা বিতর্ক। প্রাসঙ্গিকভাবেই জাতিসংঘের বিশ্ব মানবাধিকারের বিষয়টিও সে সব আলোচনা সমালোচনায় উঠে আসছে। মানবাধিকার রক্ষায় বিশ্বের শক্তিধর রাষ্টসমূহের গৃহীত পদক্ষেপ মানুষের প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক নাকি অধিকার হরণের কৌশল তা নিয়েও বিশ্বব্যাপী চলছে ব্যাপক আলোচনা।

এমনি প্রেক্ষাপটে আমরা যদি সপ্তম ঈসায়ী শতাব্দির শুরুতে ফিরে যাই, তাহলে দেখা পাব এক অনুপম মহামানবের, যিনি নর-নারী তথা সকল মানবের প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্ববাসীর সামনে হাযির করেছিলেন মানবাধিকারের সার্বজনীন রূপরেখা।

তিনি হলেন বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল। তিনি হলেন জগতের সবার জন্য Role-Model ও উসওয়ায়ে হাসানাহ। Practical Teachings এর মাধ্যমে তিনি সর্বক্ষেত্রে চমৎকার সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, তাঁর দেয়া ফর্মুলাই জগতকে দিতে পারে শান্তি, সফলতা ও মুক্তি। তাঁর পূর্বযুগে যত অজ্ঞতা ছিল, বর্বরতা ছিল, যত নির্যাতন ও শোষণ ছিল, সন্ত্রাস, ভয়-ভীতি ও সাম্প্রদায়িকতা ও শ্রেণী বিদ্বেষ ছিল, সবই তাঁর মহান আদর্শের পরশ পাথরে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

সমকালীন বিশ্বে মানুষের সার্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠায় ওহীর নির্দেশনায় তাঁর প্রবর্তিত নীতি-দর্শন ও দিক-নির্দেশনার প্রয়োগ কেবল গ্রহণযোগ্য বা প্রয়োগ উপযোগীই নয়, বরং তা একান্ত আবশ্যক। এ প্রবন্ধে আমরা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় এ মহামানবের অবদানের প্রধানতম দিকগুলো তুলে ধরব।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত প্রাপ্তির অনেক আগ থেকে তাঁর উত্তম চরিত্র ও মানবিক গুণাবলীর জন্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকরা যে সময়কে ‘জাহেলিয়াতের বা অন্ধকার যুগ’ বলেছেন সেই সময়ে জন্মলাভ করেও ঝগড়া-বিবাদ, নরহত্যা, সম্পদ লুণ্ঠন, ব্যভিচার ইত্যাদি অকল্যাণকর, মানবতার জন্যে চরম অবমাননাকর কাণ্ডে তিনি কখনো জড়িত হন নি। অথচ তখনকার সমাজে যে কোনো যুবকের জন্যে তা ছিল স্বাভাবিক। বরং তিনি ছিলেন এতিম, অসহায়, নির্যাতিতদের একমাত্র সহায়, সান্ত্বনাদানকারী, ধন-সম্পদের আমানত রক্ষাকারী এবং অনেকের আশ্রয়দাতা। চুরি-ডাকাতির ভয়ে ভীত, আতঙ্কিত মানুষ তাঁর কাছে হাজির হয়ে তাদের মূল্যবান সম্পদ আমানত রেখে যেত, আর তিনি সেই আমানতের যথাযত হেফাযত করতেন এবং যথারীতি তা ফেরত দিতেন। এভাবে নবুওয়ত লাভের অনেক আগেই আরববাসী তাকে ‘আল-আমীন’ বা ‘পরম বিশ্বস্ত’ খেতাবে ভূষিত করেছিল। নবুওয়াতের পাঁচ বছর আগে পবিত্র

কাবা শরীফ মেরামতকালে সেখানকার কালো পাথর ‘হাজরে আসওয়াদ’ স্বস্থানে তুলে নেয়ার ব্যাপারে কলহ-দ্বন্দের সূত্রপাত হয় এবং প্রত্যেক গোত্রই এই কাজ করে মর্যাদা লাভের প্রতিযোগিতায় যুদ্ধোন্মুখ হয়ে পড়ে, তখন সেই গুরুতর সমস্যার মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র ৩৫ বছর বয়সে এমন একটি সমাধান দেন; যাতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মর্যাদাই রক্ষিত হয়েছিল। সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে সে ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল, আর তা ছিল একটি চাদরের মাঝখানে পাথরটি রেখে গোত্রপতিদের দিয়ে চাদরটি ধরে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া ও সবশেষে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজ হাতে সেটিকে প্রতিস্থাপন করা।

সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, মানবিক মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার এই উদাহরণ তাঁর জীবনের শুরু থেকেই আজীবন নানাভাবে দেখা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন তিনি গোটা আরব জাহানের নেতা হয়ে উঠলেন তখন তিনি কি সমাজ জীবনে, কি পারিবারিক জীবনে, কি রাষ্ট্রীয় তথা নাগরিক জীবনে, কি বিশ্ব নাগরিক হিসাবে, সর্বক্ষেত্রে মানুষের মূল্য-মর্যাদা ও

মানবাধিকারের যে সার্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বের ইতিহাসে তা বিরল, অভূতপূর্ব। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নীতি-দর্শনের কয়েকটি দিকের উপর আলোকপাত করেলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মানুষের বেঁচে থাকার ও নিরাপত্তা লাভের অধিকার

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের জীবনের অধিকার ও জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন। নরহত্যা যেখানে নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল সেখানে নরহত্যাকে জঘন্য অপরাধ হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেছেন,

«أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْس.....»

“সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার বানানো এবং মানুষকে হত্যা করা.....।”[1] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

[1] আল্-হাদীস, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৮৭১।

«مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»

“কোনো মু‘আহাদকে (মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানরত চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিককে) হত্যাকারী জান্নাতের সুঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না। যদিও জান্নাতের সুঘ্রাণ ৪০ বছর দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।”[2]

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে (যাকে মানবাধিকারের আদি সনদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষকে সম্বোধন করে বলেছেন,

«فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُم»

“নিশ্চয়ই তোমাদের পরস্পরের জীবন, সম্পদ এবং সম্ভ্রম তোমাদের (অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে) পবিত্র, যেরূপ তোমাদের এই দিন পবিত্র তোমাদের এ মাসে তোমাদের এ শহরে।”[3]

---

[2] আল্-হাদীস, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৬৬।

[3] আল্-হাদীস, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭, ১০৫, ১৭৩৯।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মহত্যাকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং আত্মহত্যাকারী তার নিজের জীবন নিজেই শেষ করে দেওয়ার শাস্তি হিসেবে আখেরাতে আত্মহত্যার অনুরূপ পন্থায় শাস্তিভোগ করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[4]

জাহেলিয়াত বা অন্ধকার যুগে, বিশেষত আরবদের নবজাতক বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের জন্মলাভের পরপরই দারিদ্রের ভয়ে হত্যা বা জীবন্ত প্রোথিত করার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলামী সমাজে শিশু হত্যার এ জঘন্য প্রবণতাকে দণ্ডযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করে পবিত্র কুরআনের প্রত্যাদেশের মাধ্যমে[5] শিশুদের জীবনের অধিকার ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা হয়।

---

[4] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৫১-১২৫৩।

[5] কুরআনে বলা হয়েছে, ‘‘দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানকে হত্যা করো না, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা এ জঘন্য অপরাধ’’। সূরা আল-ইসরা/বনী ইসরাইল: ৩১।

বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন দর্শনে সমাজের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। ইসলামে বিবাহ সমভাবে একটি অধিকার ও ধর্মীয় দায়িত্ব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»

"আর আমি নারীদের বিবাহ করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাহ্ থেকে বিমুখ হল সে আমার আদর্শভুক্ত নয়।"[6]

প্রকৃতপক্ষে ইসলামে 'বিবাহ' কেবলমাত্র জৈবিক চাহিদা পূরণের পন্থাই নয়, বরং পারস্পরিক ভালবাসা, সমঝোতা, সমবেদনা ও নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত বিবাহ ব্যবস্থা এমন একটি সামাজিক চুক্তি যাতে নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মত বা অসম্মত হবার সমান অধিকার স্বীকৃত। বিবাহের পাশাপাশি পারিবারিক জীবনকে ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া

---

[6] আল হাদীস, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০৬৩।

হয়েছে। যেহেতু স্বামী-স্ত্রীই হল পরিবারের মূল ভিত্তি এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের উপরই প্রাথমিকভাবে পারিবারিক জীবনের শান্তি ও সুখ নির্ভর করে, তাই পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন হবে, এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়ে কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে:

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧]

“তাঁরা (স্ত্রীগণ) হবে তোমাদের (স্বামীদের) ভূষণ আর তোমরা (স্বামীগণ) তাদের (স্ত্রীদের) ভূষণ।”[7]

সম্পত্তির মালিকানার অধিকার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবর্তিত ইসলামী অর্থব্যবস্থা সমাজতন্ত্রবাদ বা পুঁজিবাদ কোনটিকেই পুরোপুরি সমর্থন করে না বরং তা একটি কল্যাণ রাষ্ট্রীয় ধারণাকে সমর্থন করে। এখানে ব্যক্তির জন্য সম্পত্তির অপ্রকৃত মালিকানা স্বীকৃত। তবে তা এতটাই নিয়ন্ত্রিত যে, ব্যক্তি এখানে সম্পদ উপর্জনের লাগামহীন

---

[7] সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৭।

স্বাধীনতা লাভ করে না। ইসলামী সমাজের সকল সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর। মানুষ দায়িত্বপ্রাপ্ত (trustee) হিসাবে এর অর্জন, ভোগ ও বণ্টনের অধিকার লাভ করে। আল-কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,

﴿ وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩ ﴾ [الذاريات: ١٩]

"তাদের সম্পদে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"[8] দান, খয়রাত, সদকা, যাকাত, ফিতরা প্রভৃতির মাধ্যমে বর্ধিত সম্পদের বিলি-বন্টন করে ইসলামে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থার কথাই কেবল বলা হয় নি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে কার্যকরভাবে তা প্রতিষ্ঠাও করেছেন।

---

[8] সূরা আল-মা'আরিজ: ২৪-২৫।

স্বাধীনভাবে চলাচল, বসবাস, রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্ব লাভের অধিকার

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্রের যে কোনো স্থানে স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের অধিকার প্রদান করে। একই ভাবে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের বাইরে যাওয়া ও অন্য রাষ্ট্রে বসবাসের অধিকারও প্রতিটি ব্যক্তিকে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে একটি 'বিশ্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা' ধারণায় বিশ্বাসী ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাষ্ট্রদর্শন অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর রাজত্বস্বরূপ- যা তিনি সকল মানুষের চলাচল ও বসবাসের জন্যে অবারিত করে দিয়েছেন।

নিপীড়ন-নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা ও অমানবিক আচরণ থেকে মুক্তি লাভের অধিকার

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনো ব্যক্তিকে শারীরিক-মানসিক শাস্তিদান বা তাকে কষ্ট দেওয়াকে রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি বলেছেন,

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ»

“প্রকৃত মুসলিম হচ্ছে সে ব্যক্তি, যার কথা বা হাত (কাজের নিপীড়ন) থেকে মুসলিমগণ নিরাপদে থাকেন।”[9] এমনকি এক্ষেত্রে অমুসলিম নাগরিকগণের অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত দৃঢ় ভাষায় তিনি বলেছেন,

«ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه ، فأنا حجيجه يوم القيامة»

“যদি কোনো মুসলিম অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার উপর সাধ্যাতীত বোঝা (জিযিয়া বা প্রতিরক্ষা কর) চাপিয়ে দেয় অথবা তার কোনো বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষাবলম্বন করব।”[10] রাসূল

[9] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৮৪।

[10] আল-বায়হাকী, মা‘রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার, হাদীস নং ৫৭৫০।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো অপরাধের জন্য অন্যকে দণ্ড দেওয়ার যুগ যুগ ধরে প্রচলিত রেওয়াজও চিরতরে রহিত করে দেন। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক অভিভাষণে তিনি বলেন,

«ألا لا يجني جان إلا على نفسه . لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده»

“জেনে রাখ, কারো অপরাধের জন্য তারা নিজেকেই দণ্ড বহন করতে হবে। সুতরাং পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধে জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না।”[11] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ঘোষণার মূলে ছিল কুরআনের সেই বাণী,

﴿ كُلُّ ٱمۡرِيِٕۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٞ ٢١ ﴾ [الطور: ٢٠]

“প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী।”[12]

---

[11] আল-হাদীস, সুনান ইবনু মাজা, হাদীস নং ২৬৬৯ ও সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ২১৫৯।

[12] সূরা আত-তূর: ২১।

﴿وَلَا تَكۡسِبُ كُلُّ نَفۡسٍ إِلَّا عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۚ﴾ [الانعام: ١٦٤]

"প্রতিটি ব্যক্তি যা অর্জন করে তা শুধু তারই উপর বর্তায়, আর কেউ অন্যের বোঝা বহন করে না।"[13]

অবাধ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অধীনে ন্যায়বিচার লাভের অধিকার

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক-সামাজিক পেশাগত মর্যাদা নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক একটি নিরপেক্ষ, অবাধ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অধীনে স্বাভাবিক ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার লাভ করে। মূলত ন্যায়বিচার ধারণার উপর ইসলামে এতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, কুরআনে প্রায় ষাটটি আয়াতে এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন একটি আয়াতে বলা হয়েছে,

---

[13] সূরা আল-আন'আম : ১৬৪।

﴿ ۞يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ ﴾ [النساء : ١٣٥]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে, যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকট আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।"[14]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খিলাফতের শাসনামলে ইসলামে বিচার ব্যবস্থা যা শাসক গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপমুক্ত, স্বাধীন, অবাধ ও নিরপেক্ষ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে, তা ছিল মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানবতাবোধ ও মানবাধিকারের উদার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎসারিত।

শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায়

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন যে,

﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ۝١٠٧ ﴾ [الانبياء: ١٠٧]

---

[14] সূরা আন-নিসা: ১৩৫।

“আমি তোমাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্যে রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।”[15] কুরআনের এ বাণী পরিপূর্ণভাবে সত্যে পরিণত করেছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সমাজ, রাষ্ট্র ও সমগ্র মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব, শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় তিনি যে অনন্য সাধারণ উদাহরণ রেখে গেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা আজো অদ্বিতীয় এবং সর্বজনস্বীকৃত অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে পরিগণিত। কেননা তিনি কেবল মুসলিমদের আদর্শ ছিলেন না, ছিলেন গোটা মানব জাতির আদর্শ। আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে এই মর্মে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন,

﴿ قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا ﴾ [الاعراف: ١٥٨]

“বলুন (হে নবী), হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রাসূল।”[16]

---

[15] সূরা আল-আম্বিয়া: ১০৭।

[16] সূরা আল-‘আরাফ: ১৫৮।

দয়া, ক্ষমা ও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায়

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, ক্ষমাশীল ও কোমল। দয়া, ক্ষমা, শান্তি ও সাম্যের প্রতিরূপ এই মহামানব স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন,

«لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاس»

"যে মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে দয়া করেন না।"[17] এখানে কেবল মুসলিমদের কথাই নয় বরং গোটা মানব জাতির কথা বলা হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শনকে তিনি নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। অন্য একটি হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاء»

"যমীনে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া করা, তাহলে উর্ধ্বালোকে যিনি আছেন তিনি তোমার প্রতি সদয় হবেন।"[18]

---

[17] হাদীস নং ৭৩৭৬, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬১৭২।

[18] সুনান আবি দাউদ, হাদীস নং ৪৯৪৩, সুনান আত-তিরমিযি, হাদীস নং

অন্যদিকে শ্রমিক অধীনস্থ কর্মচারী ও চাকর-চাকরানীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা, তাদেরকে নিজেদের অনুরূপ খাওয়া-দাওয়া প্রদান, পোশাক-আশাক দেওয়া ও বিশ্রাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেও তিনি বারংবার তাগিদ দিয়েছেন। বস্তুত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শ্রমিকদের সব প্রকার বঞ্চনা, অত্যাচার, নিপীড়ন আর গ্লানির অবসান করে এমন সব শ্রমনীতির প্রবর্তন করে গেছেন যার সিকি শতাংশও জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আই.এল.ও) বিগত ১১৮ বছর ধরে মে দিবস উদযাপনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি।

তাঁর এই গুণাবলী ও দৃষ্টিভঙ্গিতে মুগ্ধ বিখ্যাত দার্শনিক, সাহিত্যিক জর্জ বার্ণাড শ' তাই বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি, "If all the world was united under one leader, Mohammad would have been the best fitted man to lead the peoples of various creeds, dogmas and ideas to peace and happiness."

১৯২৪।

নারী অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি। নারী মুক্তির প্রবক্তা হিসাবে আমরা হয়ত কেট মিলে (Kate Millet), জার্মেন গ্রীয়ার (Germaine Greer) বা অ্যানী নূরাকীন (Anee Nurakin) প্রমুখের নাম জানি; এক্ষেত্রে আরো উল্লেখ করা হয় মেরী উলস্টন, অ্যানী বেসামন্ত, মার্গারেট সাঙ্গাঁর, সুলতানা রাজিয়া, বেগম সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ মহিলাদের সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীর অধিকার ও মর্যাদার জন্য যে ব্যক্তি প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠেন, নারীকে সংসার ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অংশ হিসাবে যে ব্যক্তি প্রথম স্বীকৃতি দেন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর অধিকার পরিপূর্ণ আকারে যে ব্যক্তি প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন, সত্যিকার অর্থে যিনি নারী জাগরণ ও নারী মুক্তির প্রবক্তা, তিনি হচ্ছেন 'একজন পুরুষ' এবং তিনি আর কেউ নন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একথা আদৌ অত্যুক্তি হবে না যে, জীবনে অন্য কিছু না করলেও শুধুমাত্র নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানই বিশ্ব মনীষায়

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুউচ্চ আসনে সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম পদক্ষেপ ছিল কন্যা শিশু হত্যা বন্ধ করা। তিনি বরং কন্যা শিশুর লালন-পালনকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং নিজেও তাঁর কন্যাদের লালন-পালন কালে সেটা করে দেখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন,

«خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»

“(পুরুষদের জন্যে) দুনিয়ার সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে উত্তম স্ত্রী।”[19]

অন্যদিকে নারীকে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী করেছেন। হাদীসে এসেছে,

---

[19] মুসলিম, ১৪৬৭।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوك»

“আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে কে আমার কাছে সর্বোত্তম সম্মান, মর্যাদা ও সদ্ব্যবহার পাবার যোগ্য? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সাহাবী আবারো জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার বাবা।”[20] নারী মুক্তির দিশারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীকে শুধু বাঁচিয়ে রেখে মর্যাদা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তিনি নারীকে যথাযথ অধিকার দিয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। নারীকে তিনি অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত, আইনগত এবং ধর্মীয় সব দিক দিয়ে তার অধিকার নিশ্চিত

[20] আল-হাদীস, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৭১।

করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তসমূহকে সংক্ষেপে এভাবে উল্লেখ করা যায় :

ক. নারীকে পিতার সম্পত্তিতে, স্বামী, সন্তান ও মায়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী ধার্য করা হয়েছে।

খ. বিয়ের সময় নারীকে মোহরানা বা দেনমোহর প্রাপ্তি আবশ্যিক করেছেন এবং তা আদায় না করার বা তা থেকে জোর করে ব্যয় করার অধিকার স্বামী, পিতা বা ভাই কাউকে দেওয়া হয় নি।

গ. নারীকে স্বামী নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কোথাও বিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে একজন অকর্মন্য, অত্যাচারী স্বামী থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্ণ অধিকার নারীকে দেওয়া হয়েছে। একই সাথে বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারীকে ২য় বিবাহের বা পুনঃবিবাহের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

ঘ. দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন নি তিনি।

ঙ. বিদ্যাশিক্ষা করা বা জ্ঞানার্জন করার ব্যাপারে নারীকে পুরুষের মতই সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘‘জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম (নরনারী) এর উপর ফরয বা অবশ্য কর্তব্য’’।

চ. অত্যাচার, অপমান, অশালীনতা ও অবমাননা থেকে নারীকে রক্ষার জন্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের পোশাক পরিধানে ও জনসমক্ষে চলাফেরার সময় একটি অনুসরণীয় পোষাক-বিধি (Dress Code) মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।

উপসংহার

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জীবনদর্শন, মানবিক মর্যাদার রূপরেখা, মানবাধিকারের পরিধি ও সীমা নির্দিষ্ট করেছেন তা মহান আল্লাহ তা‘আলারই অনুমোদিত জীবন বিধান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই জীবন বিধান যা মানবাধিকারের প্রথম মৌলিক এবং পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা হিসাবে স্বীকৃত তা কেবল কোনো দলীল লিখিত নয়, কোনো স্বাক্ষরিত

চুক্তি নয়, কোনো অনুকল্প নয় (hypothesis) , বরং তা হচ্ছে কঠোর বাস্তবতা। নিজের শৈশব থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ৬৩ বছরের প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত রেখে নিজের জীবদ্দশাতেই একটি ধ্বংসস্তুপ থেকে, একটি পুঁতিগন্ধময় অন্ধকার আস্তাকুড় থেকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবিক মুল্যবোধকে তুলে এনে এক সুষম, অনুসরণযোগ্য, সার্বজনীন কল্যাণকর সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন – মানবাধিকার, মানুষের মর্যাদা ও আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যই ছিল যার ভিত্তি।

মানবতার মুক্তিদূত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে এই অর্জন, এই স্পষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য কল্যাণকর জীবন বিধান বিশ্বের অনেক গবেষক, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে। মাইকেল হার্ট 'দ্য হানড্রেড' গ্রন্থে একশ জন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম-বিন্যাস করেছেন। তালিকার প্রথমেই (অর্থাৎ ১ নম্বরে) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দ্বিধায় দাঁড় করিয়ে তিনি লিখেছেন: "My choice of Muhammad to lead the list of the world's most

influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular levels."[21] নির্দ্বিধায় তাই বলা যায়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মানব মর্যাদা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

[21] প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫।